বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'শুরু করি ভূমির নামে'র নির্দেশনা প্রসঙ্গ

সাইদুর রহমান লিপন

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতাত্তোর কালে এইদেশের শিল্প—সাহিত্যের ভুবনে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়, সে চেতনায় সর্বাধিক সফলতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে যে মাধ্যমটি ইতোমধ্যে তার শক্ত একটি ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের থিয়েটার। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত অদ্যাবধি স্বাধীন বাংলাদেশের সিংহভাগ নাট্যচর্চা পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী নাট্যরীতি বা পদ্ধতি দ্বারা আচ্ছন্ন। যদি এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি কারণ হয়ে থাকে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড এবং এর ভূখণ্ড অধিকৃত বহু বিচিত্র মানুষের নিজস্ব জীবনাচার ও সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধ, তাহলে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থাপনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসৃত হবে? কেন তা উপস্থাপনায় বাংলাদেশেরই লোকনাট্যের ঐতিহ্য অনুসৃত নাট্য-আঙ্গিক সিদ্ধ হবে না? এতদ্ব্যতীত, এইদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়,— চর্বিত চর্বণ আর ক্লিশে হয়ে পড়া কিছু 'রাজাকার, পাকসেনা আর মুক্তিযোদ্ধাদের' দ্বন্দ্ব সর্বস্ব আখ্যান। যা বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মনে নতুন কোনো বোধ তৈরি করতে প্রায় অক্ষম। এ রকম একটি ভাবনার আবর্তে থেকে আমি সাইমন জাকারিয়া রচিত 'শুরু করি ভূমির নামে' নাটলিপিটির নির্দেশনায় উজ্জীবিত হই। কেননা, 'শুরু করি ভূমির নামে' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি নাটক এবং এই নাটলিপিতে লোকনাট্যের উপাদান ব্যবহারের একটি সচেতন প্রয়াসও লক্ষণীয়।

০১.

'শুরু করি ভূমির নামে' প্রযোজনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার বোধন থিয়েটার আমাকে নির্দেশনার সুযোগ করে দেয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস মহড়ার পর ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ও ১৭ জুন কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমী অডিটোরিয়ামে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। 'জনগণের জন্য শিল্প' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে 'বোধন থিয়েটার' ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের যাত্রা শুরু করে। সমাজের

পরিবর্তনশীলতার ধারায় নিজেদের যুক্ত করে দেশব্যাপী একটি সুস্থ নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই নাট্য সংগঠন এ পর্যন্ত ১৭টি মঞ্চ নাটকের প্রযোজনা সম্পাদন করে। 'শুরু করি ভূমির নামে' তাদের ১৬ তম প্রযোজনা।

সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় নাটকের মূল বক্তব্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং যুদ্ধত্তোর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট। এখানে নাটকের মূল বক্তব্য শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ঘটনাবলিতে আবদ্ধ নয়, ভূমির অধিকার-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বকে সভ্যতার আদিমতম একটি দ্বন্দ্ব হিসেবে বিবেচনা করে ৭১'এর যুদ্ধকে ভূমি দখলের লড়াইয়ের সামিল করা হয়েছে। এই ভূমি আবিষ্কৃত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ইতিহাস অনুসন্ধানের পথে—ভূমির খনন কার্যের মাধ্যমে। ইতিহাস অন্বেষণে এই খনন কার্য সম্পর্কে নাট্যকার সাইমন জাকারিয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে—

'মুক্তিযুদ্ধের যদি কোনো টেরাকোটা না থাকে—তবে কী তার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ভূমির স্বাদ ও ঘ্রাণকে গুরুত্ব দেয়া হবে না? তখন নতুন দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক আলো লেগে মাটিতে লুপ্ত অস্থিগুলো কী ঝিলিক কেটে উঠবে না? কখনো মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের শ্রুতিকথার চেয়ে, ইতিহাসের কাগজে পৃষ্ঠার চেয়ে আরো বেশি বিশ্বস্ত দলিল মাটি খুঁড়ে পাওয়া অস্থিগুলো, রক্তমাখা কাপড়গুলো, মাটির ঘ্রাণ এবং স্বাদ।'[১]

অন্যদিকে ভূমির সাথে নারীর সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে যে, রজস্বলা ভূমি ও নারীর মধ্যে একটি গোপন ও অভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এখানে ভূমি এবং নারী উভয়কে মাতৃতান্ত্রিক শক্তি বা উর্বরা শক্তির সমার্থক করে দেখা হয়েছে। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই 'লবঙ্গ' নামক একটি নারী চরিত্রের সৃষ্টি। অর্থাৎ 'বঙ্গ' ভূমি এবং 'লবঙ্গ' নারী উভয়কে অভিন্ন শক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে।

০২.

নাটলিপি

'শুরু করি ভূমির নামে' রচনার মাধ্যম গদ্য যা বর্ণনাত্মক গদ্য এবং সংলাপাত্মক গদ্যে বিন্যস্ত হয়েছে। তবে আখ্যানের কিছু নির্দিষ্ট অংশের জন্য 'পদ' রচনা করা হয়। আখ্যান পরিবেশনায় এই পদ সমূহ 'গীত' আকারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'কাব্যাভিনয়ের' মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি সহ নাটলিপির সার-সংক্ষেপ উল্লেখ সাপেক্ষে প্রযোজনার সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বন্দনা :

'শুরু করি ভূমির নামে' নাটলিপি ও প্রযোজনায় বন্দনা সঙ্গীত-এর ব্যবহার হলেও বিষয়গত দিক থেকে লোকনাট্যের প্রচলিত বন্দনা রীতিকে অনুসরণ করেনি। এখানে আল্লা-রাসুল, দেব-দেবী, দিক-দর্শক প্রভৃতিকে বন্দনার পরিবর্তে সভ্যতার

১ সাইমন জাকারিয়া : প্রযোজনা নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য

বিবর্তনে আদিযুগ থেকে ভূমি ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে তুলে ধরে শুধু ভূমিকেই বন্দনা করা হয়েছে। ভূমির সাথে মানুষের যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এই বন্দনা সঙ্গীতের মধ্যে। অন্যদিকে সমাপ্তি সঙ্গীতে ভূমির প্রতি মানুষের স্বার্থহীন ভালবাসা আর অধীনতা স্বীকারের মাধ্যমে মানব কল্যাণের আহবান জানানো হয়েছে। বন্দনা ও সমাপ্তি সঙ্গীতের যোগসূত্রেই বিন্যস্ত হয়েছে মূল আখ্যান বা কাহিনী। ফলে এই প্রযোজনায় বন্দনা সঙ্গীত লোকনাট্যরীতির ন্যায় মূল আখ্যান বহির্ভূত অঙ্গ বা উপাদান হয়ে থাকেনি বরং মূল আখ্যানের অংশ হয়ে বর্ণনাত্মক গীত উপাদান হিসেবে পরিবেশিত হয়।

বন্দনা সঙ্গীতের দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে 'প্রার্থনা সঙ্গীত' যেখানে প্রকৃতিকে স্মরণ করা হয়। সকল প্রকার অসত্য আর বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল বন্দনার সঙ্গীত-এর মাধ্যমে ভূমির সাথে মানুষের সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়।

প্রার্থনা সঙ্গীত :

চারিদিকের নীরব বাতাস—কথা কও
চারিদিকের নীরব বৃক্ষপাখি—কথা কও
হে প্রকৃতি কথা কও, কথা কও, কথা কও ॥
সকল প্রপঞ্চ খুলে আমাদের এই পথভ্রমের
মুক্তি দাও. মুক্তি দাও, কথা কও, কথা কও ॥... ...

বন্দনা সঙ্গীত :

বন্দনাতে করলাম আমি
ভূমিকে ছালাম
ও ভাই মাটিকে ছালাম
এই ভূমিতে মানব সৃষ্টি
কহিছে কালাম
সেই না মানব মাটির দেহ
ছিল যাযাবর
হাজার বছর ন্যাংটা ছিল
ছিল না যে ঘর।
এমন করে হাজার বছর
পশুর পিছে ঘুরে
বনের পশু শিকার করে
আহারও যে করে।
... .
এই না মানব মাটির দেহ
ছিলে যাযাবর

ভূমি ছিলে পায়ের তলায়
ছিলে পরস্পর
এই ভুঁই আমার
ওই ভুঁই আমার
কাটাকাটি হয়
শুরু করি ভূমির নামে
অধীন সাইমন কয় ॥

বর্ণনাত্মক গদ্য :

গায়েন : একবার ওই গড়াই উপকূলে এক নৌকা বাইচের আসর বসে ছিল—আসরে শত শত লোক সেদিন গড়াই বক্ষে বাইচ নৌকার ঘণ্টাধ্বনিতে- গানে- গতির উন্মাদনায় মাঝে মাঝেই হই হই করে উঠছিল। কিন্তুক এরই মধ্যে সেদিন সন্ধ্যায় কোথা থেকে এক বায়ুচক্র এসে উড়ায়ে দেয় চরের রূপামুখীবালি—সাথে সাথে সাদা-শুভ্র চিকচিকে বালির আঘাতে সকলের চক্ষু রুদ্ধ হয়—আর তারা হস্ত দলিত করতে থাকে নিজেদের চক্ষুদ্বয়। বালিতে- দলনে রুদ্ধচোখ ভেঙে পানি নেমে আসে—তারা অন্ধ হয়ে ওঠে।এরপর নদীতে ঝড় উঠলে সকল মানুষ এবং বাইচ নৌকার দল তাড়া করে ফিরে চলে বাড়ির পথে। কিন্তু একটি বাইচ নৌকা নদীর স্রোত আর বায়ুচক্রে পড়ে পথ ভুল করে ছুটে চলে অজানা পথে। কৌতূহলী আর উন্মত্ত চোখে তারা তবুও ছুটে চলে সেই বিক্ষুব্ধ নদীর ঢেউ ভেঙে ভেঙে সেই অজানার পথে।

বর্ণনাত্মক গীত :

গায়েন (রুস্তম) : হেইয়া হো হেইয়া
হেইয়া হো হেইয়া ॥
বেগমতি নদীর বুকে
বৈঠা মারো হেইয়া।
নদীর যেমন ইচছারে ভাই
সেই দিকে যাও—হেইয়া।

এইভাবে তাদের উন্মত্ত চলার পথে এক সময়ে অন্ধকার নেমে আসে। হঠাৎ তাদের দূর সম্মুখে ভেসে উঠে একখণ্ড ভূমি। কিন্তু প্রথমে তারা সেই ভূমিকে জেগে ওঠা চর ভাবতে পারে না বরং যে যার মত করে সেই চরকে কুষ্টার জাগ, কালা পানি, ভেসে থাকা গামছা প্রভৃতি নামে ব্যাখ্যা করতে থাকে। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ মাঝি করিম এই সুযোগে 'রুমাল ও রাজকন্যা' নামে একটি রূপকথার গল্প শোনায় সবাইকে। এইভাবে তারা চর নিয়ে নানা রকমের গল্প বলতে বলতে

ছুটে চলতে থাকে সেই চরেরই দিকে। সহসা অন্ধকার পথে বাইচ নৌকাটি চরের সাথে ধাক্কা লেগে থেমে গেলে চর তখন তাদের মধ্যে আরেক কৌতুহল জাগিয়ে তোলে। নতুন আরেক ভ্রমের ঘোরে তারা দেখতে পায় অন্ধকারে ছায়ারূপী এক নারী। সবাই ছুটে চলে সেই নারীর দিকে, তাকে নিয়ে গান গায়, আনন্দ হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে। কিন্তু এরমধ্যে দলের একজন মাঝি-গাজী নারীকে ধরতে গিয়ে লতাগুল্ম জড়িয়ে ফিরে আসে তখন তাদের এই ভ্রম ভেঙে যায়। আসলে তারা যা দেখেছিল তা কোনো নারী নয়, তাদের দেখাটা ছিল একটা ভ্রম মাত্র। কিন্তু তখনোও তাদের মধ্যে চরের রহস্য দুর্বোধ্য থেকে যায়। কেউ মনে করে তারা করিম চাচার গল্পে বলা সেই 'র মালি'র উপরে এসেছে আবার কেউ বলে ঘাসের চরে এসেছে। কৌতূহলী দ্বন্দ্বের এরকম একপর্যায়ে দলের আরেক মাঝি রমজান একমুঠো ঘাস সুদ্ধ মাটি নিয়ে সবাইকে মাটির স্বাদ নিতে বলে। প্রথমে কেউ রাজি হয় না, কিন্তু পরে সবাই ঘাস আর মাটির স্বাদ নেয় কিন্তু রমজান মাটিতে রক্তের স্বাদ পায়। রক্তের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়—মাটির সাথে রক্তের সম্পর্ক কী হতে পারে তারা ভেবে পায় না। কিন্তু রমজানের কথা মতো সবাই খুঁজতে থাকে এর রহস্য, কিন্তু কিছু না পেয়ে এবং ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কৌতূহলী রমজান না ঘুমিয়ে গোপনে দলছুট হয়ে চলে এই রহস্য উদ্ধারে। অন্যদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মাঝির দলের ঘুম ভাঙে পরদিন বিকেল বেলায় এবং স্বাভাবিকভাবেই তখন সূর্য অস্ত যাবার পথে। আর তারা ঘুম ভেঙে সেই বিকালকে সকাল ভাবতে থাকে। কিন্তু সকালের সূর্য কেন অস্ত যাবে? এইভেবে তারা আবারও ভ্রমে পড়ে এবং কেয়ামত শুরু হয়েছে বলে চিৎকার আর বিলাপের সুরে কান্না শুরু করে দেয়। অন্যদিকে দল ছুট হয়ে রমজান চলে যায় এক গহীন বনে যেখানে ঐ অঞ্চলের অধিপতি প্রভুজীর কন্যা লবঙ্গ'র দেখা পায়। কন্যাকে রমজানের ভাল লেগে যায় এবং তার মনের কথা প্রকাশ করলে প্রভুজীর লাঠিয়াল পদহরি তাকে ধরে নিয়ে প্রভুজীর গৃহে বন্দী করে রাখে। এদিকে কেয়ামত কেয়ামত বলে বিলাপরত মাঝির দলের একজনের খেয়াল হয় যে কেয়ামতের সময় মাটির নিচ থেকে সকল নামী-দামী সম্পদ বের হয়ে আসবে। এই লোভে তারা মাটি খুঁড়তে থাকে হঠাৎ দূরে উঁচু উঁচু কালো কিছু একটা দেখতে পেয়ে ঢিল ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু ঢিল পড়ে সেখানে ঝনাৎ করে শব্দ হয়। এতে তারা নতুন করে বিস্মিত হয়।

সংলাপাত্মক গদ্য :

করিম : মাটির শব্দ ঝনাৎ !
রুস্তম : ঝনাৎ !
আকবর : চাচা ব্যাপারডা কি...
করিম : মনে হচেচ ব্যাপার ওকেনে আচে.. চ' যা'য়া দেকি
সকলে মিলে সেই 'পোয়াতি' (উঁচু হয়ে থাকা মাটি) মাটির

কাছে যায়—এবং মাটির সেই ঢিবিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে উল্লাস করতে থাকে এই ভেবে যে তারা মহামূল্যবান কোনো সম্পদ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এক পর্যায় সকলে থমকে যায়—

রুস্তম : করিম চাচা ... তুমি না ক'লে কিয়ামতের ভূমিকম্পে উগ্‌রানে নামী-দামী সুম্পদির কতা.. আমি কই কি—এই পুয়াতি মাটির মুদ্দিই সেই সগোল সুম্পদ থাকতি পারে
করিম : হ হ পারেই তো... আয় খুঁড়ে দেকি...
গাজী : করিম চাচা... রূপার নাহাল ঝিলিক কাটে—উডা কি গো...
হার : মণি মুক্তো হ'তি পারে... আয় আরো খুঁড়ে দেকি...
গাজী : এ-কি মানষির হাড়...
আকবর : হাতের হাড়
করিম : ওই তো মানুষির আঙুলের হাড়
খায়রুল : একুনো তো ঠিক ঠিক মুঠো করে আচে
হার : আর মুটোর মুদ্দি কাচির হাতল
গাজী : নিড়ানির হাতল
আকবর : কুড়োলির হাতল
করিম : খুন্তির হাতল
হার : তা'লি কি মরার সুমায় এইসব হাতে ছিল ... একুনো আচে
করিম : কিন্তুক মানুষির আর হাড় কই ... শুদু হাতের হাড় দেকি... আর হাড় কই...
গাজী : করিম চাচা... কিয়ামত করে তালি কি এই মাটি তার নামি দামি সুম্পদির বদলি এই হাড় আর লুহা তুলে দিল...
করিম : তালি আমরা সত্যিই কিয়ামতেই পড়িচি রে ... ও আল্লা গো আল্লা...

পুনরায় তারা কিয়ামত কিয়ামত বলে আহাজারি শুরু করে দেয়। কিন্তু ঐ দিকে প্রভুজী তার কন্যাকে প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করায় রমজানকে শাস্তি দিতে চাইলে রমজান ক্ষমা ভিক্ষা চায়। এরই মধ্যে পদহরি ছুটে এসে প্রভুজীকে মাঝি দলে ঐ সকল অদ্ভুত আচরণের কথা জানায়। শুনে প্রভুজী ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে চলে সেই ভূমির কাছে। অন্যদিকে বিলাপরত মাঝির দলের একজনের চোখ হঠাৎ স্থির হয়ে যায়—

গাজী : অম্বা চোক হিঙে এই হাড় লুহার মুদ্দি কি দেকিস—ক'স নে ক্যা
খায়রুল : না হে না ... র মালির গাও (র মাল) মনে হচেচ
করিম : রুমালির গাও...
রুস্তম : হ হ রুমালির গাও

সকলের হাতে হাতে চলে যায় রুমাল কিন্তু রুমাল যেন আর শেষ হয় না।

একে একে সকলের হাত ঘুরে আসে তবুও রুমালের শেষ নেই। সকলে রুমালের গন্ধ শুঁকে আকুল হয়ে ওঠে। কেউ বলে রক্তের বাসনা, কেউ বলে আমের কষ। সকলেই যখন নিশ্চিত হয় যে কাপড়ে মানুষের রক্তই লেগে আছে, তখন গাজী চিৎকার করে ওঠে—

গাজী : আরে ধেৎ .. ওসব রক্ত টক্ত কিছু না... এটা হচেচ গিয়ে আমার ল্যাজ।

এই বলে তারা মাটি খুঁড়ে পাওয়া রক্তমাখা কাপড় নিয়ে এভাবে লেজ লেজ খেলতে থাকে। প্রভুজী তার লঠিয়াল নিয়ে ছুটে আসে এবং এই কা দেখে প্রচ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রভুজী তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় সেখানে রমজানের সাথে দলের অন্য সকলের দেখা হয়। রমজান ওদের বন্দী হওয়া কারণ শুনতে পেয়ে আর্ত চিৎকার করে ওঠে—

রমজান : কাপুড়.. এই কাপুড় তোরা কোনে পালি

গাজী : ক্যা ...পুয়াতি মাটি খুঁড়ে পাইচি

আকবর : এ নাকি কোন আগপুর ষের কাপড়

রমজান : আগপুর ষের কাপড় ! ... দেকি দেকি ... হ হ এই তো তাদের রক্ত লাগে আচে ... এই তো মনে হচ্ছে—এই সেই কাপুড় সীতার ফ্যালে যাওয়া গয়নার মতো কিচু ... হ হ রাবণসুমায় যাদের হরণ করে নিয়ে গেচে—তারা পতের বাঁকে বাঁকে রাকে গেচে তাদের কাপুড় লুহা আর হাড়ের গয়না... চাচা দ্যাকো এ যিন সেই সতীর কাপড়...

করিম : এ তুই কি ক'স ... আমি তো কিচুই বুঝতি পাত্তিচনে... কোনকার এই পুরোন রক্তলাগা কাপুড় নিয়ে এই তুই কি শুরু করলি... ক' তো দেকি... এ পাগলামির কোনো মানে হয়.. থাম বাবা পাগলামি করিসনে ...

এর মাঝে প্রভুজী চলে আসে। তখন সকলে মিলে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। শুনে প্রভুজী তাদের একটি শর্ত দেয় যে, 'কচু পাতার ওপর আগুনের ফুলকি'টি কি? যদি তারা এই ধাঁধাঁটির উত্তর দিতে পারে তবেই তাদের মুক্তি হতে পারে। সকলে দূরে দেখানো সেই কচু পাতার কাছে গিয়ে ধাঁধাঁর উত্তর খুঁজতে থাকে এবং ব্যর্থ হয়। কিন্তু রুস্তম আর রমজান বুঝতে পারে এই ধাঁধাঁর কি উত্তর হতে পারে। এরপর তারা দুজনে এই চরে আসার পর থেকে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার হিসেব কষে নিয়ে বুঝে যায় রক্ত আর আগুনের ফুলকি আর সবুজ ঘাস আর কচু পাতার কি মানে হতে পারে—

সংলাপাত্মক গদ্য :

রুস্তম : হ হ বুঝতি পারচি ..এই রক্ত—ওই রক্ত, সেই রক্ত আর ওই হাড় লুহা কাপুড় .. আমি সব বুঝতি পাচিচ রে রমজান ... এ

যে সেই কাহিনী সেই ভুমির কাহিনী ... পায়া গিচি ধাঁধাঁর উত্তর প্রভুজী আমি ..আমি কবো ধাঁধাঁর উত্তর—

বর্ণনাত্মক গীত :

গায়েন (রুস্তম) : এক যে ছিল ভূমি শোন- শোন বিবরণ।
এক যে ছিল ভূমি শোন - শোন দিয়া মন ॥
ধনে গুণে পূর্ণ ছিল করি যে বর্ণন।
ভূমি ছিল রাণী যে তার ছিল না রাজন ॥
মনের দুঃখ ছিল তাহার ছিল না স্বাধীন... ...

বর্ণনাত্মক গদ্য :

গায়েন : প্রভুজী - কাহিনীর এখানেই শেষ নয় ...যুগে যুগে বিচিত্র প্রজাতি ও নিষাদের ইচেছর হাতে বন্দী রাজনহীন সেই ভূমির কোনো দিনই মুক্তি ঘটে নাই .. বারেবারে তার সম্ভ্রম খোয়া যায়...তবু যুগে যুগে নিষাদেরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নেমে আসে ... নেমে আসতেই থাকে.. ওই যে ছুটে আসছে আরেক নিষাদ...

সংলাপাত্মক পদ্য :

নিষাদ : আমরা আসি আকাশ পথে
এই পথে আসে দেবদূত
শোনো আমাদের ভাষা
আমাদের ভাষা
তোমাদের ভাষা

কোরাস : না
না
না

নিষাদ : অবোধ সকল শোনো
আমরা আসি আকাশ পথে
যেই পথে আসে দেবদূত
জানো আমাদের ভাষা
আমাদের ভাষা
তোমাদের ভাষা

কোরাস : না
না
না
মায়ের ভাষা
আমার ভাষা।

নিষাদ : তবে রে অবাধ্যকুল... হই হই

বর্ণনাত্মক কাব্য :

(যন্ত্রীদলের একজন) :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমাবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

এরপর গায়েন (রুস্তম) ৫২ থেকে ৭১-এ নিষাদের আগমনের কাহিনী বর্ণনা করতে থাকে এবং সেদিনের সেই ভূমির সাথে রক্ত, ঘাম লোহা হাড় আর কাপড়ের সম্পর্ক নির্ণয় করে আর বলে—

বর্ণনাত্মক গদ্য :

গায়েন : ওই মাটি তাদের দেহের ঘাম চোষে... চোখের পানি চোষে... বুকের রক্ত চোষে... আহারে মাটি আর পারে না... মাটিতে নেমে আসে কচুর পাতা... সেই দিন কি খুব বাতাস ছিল ... বাতাসে খুব গান ছিল... যেদিন জয় হলো... পাতাটির উপর গড়িয়ে যায় পানি... সে যে ঘামের পানি চোখের পানি তার সাথে গাঢ় লাল... সে যে রক্ত... শুয়ে থাকে কচুর পাতা... সে কি মাটিতে সালাম করছে আজ... নাকি সে যুদ্ধের ক্লান্তির বশে এই মাটিতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চাচেছ কিন্তু ক'টা দিন যেতে যেতে পাতাটি যেন উঠতে থাকে... একটু একটু করে... সেই পাতা আজ আলো হাতে ... আলোর বহুকোণী স্ফুলিঙ্গ হাতে...

এইভাবে রুস্তম ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান করলে সকল মাঝিদের ভুল ভাঙে। তারা বুঝতে পারে এই চর হচেছ একাত্তরের রক্ত মাখা সেই ভূমি। এরপর প্রভুজীর কাছে মুক্তি চাইলে প্রভুজী পুনরায় আরেকটি শর্ত দিয়ে বলে যে, সে তার এক কন্যাকে দিবে যদি সবাই মিলে তাকে সমানভাবে ভালবাসতে পারে তবেই তাদের মুক্তি হবে, অন্যথায় সে ঘাস লতা পাতা আর ভূমির সাথে মিশে যাবে। এইকথা বলে প্রভুজী তার কন্যাকে দেখালে- কন্যার রূপ দেখে সকল তাদের শর্তের কথা ভুলে যায়—

রমজান : এতো দেকি লবঙ্গ... আমার লবঙ্গ...লবঙ্গ... লবঙ্গ

গাজী : ওরে থাম- তোর মানে

রমজান : মানে কিচু নাই লবঙ্গ আমার

হার : অ্যা... আমারও.. কলি'ই হলো প্রভুজী যে ওরে আমাদের সকলেরে দিয়ে গেলো... তাই যুদি হয় তালি তো ও আমারও

খায়র ল : তালি লবঙ্গ আমারও

প্রভুজী শর্তের কথা ভুলে গিয়ে সকলে লবঙ্গের অধিকার নিয়ে লোভী আর হিংস্র কাড়াকাড়ি করতে থাকলে লবঙ্গ মনের কষ্ট নিয়ে ঘাস লতা পাতা আর ভূমির সাথে মিশে যায়। কেউ আর সেই কন্যাকে পায় না।

বর্ণনাত্মক গীত :

গায়েন : স্বপ্ন হইল লোভেতে নিঃশেষ
ওরে প্রাণের বঙ্গ বঙ্গরে ॥
ভূমি হইল মায়ের সমান
করি যেন তারেই সম্মান ॥
ভূমির নামে জানাই প্রণাম
আছেন যারা আসরে।
লোভে হইল সবই মাটি রে
বঙ্গ গেল মিশিয়া ॥
ও বঙ্গ রে...
(সমাপ্তি)

'শুরু করি ভূমির নামে'র পাণ্ডুলিপিটি মিশ্ররীতিতে বিন্যস্ত। অর্থাৎ এখানে সংলাপাত্মক অভিনয় উপাদানের পাশাপাশি বর্ণনাত্মক অভিনয় উপাদানের সমন্বয়ে আখ্যানটির ঘটনা সমূহ পরিণতিতে গমন করে। কিন্তু এই আখ্যানে কোনো নায়কের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিণতি নেই। বরং সমগ্র আখ্যানে একটি অতিলৌকিক অভিযাত্রা-ধর্মী কিংবদন্তী বা রূপকথার অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রহস্যময় কিছু ঘটনা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ৭১-এর রক্তক্ষয়ী ভূমির স্বরূপ তুলে ধরা হয়।

'শুরু করি ভূমির নামে' একটি বিয়োগান্তক আখ্যান এবং ঘটনা বিন্যাস পাশ্চাত্য বাস্তবধর্মী নাট্যরীতির প্লট বিন্যাস অনুসরণ করে রচিত। অর্থাৎ যে রহস্যময় ভূমি আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে দ্বন্দ্বের বিকাশ (Rising conflict) লক্ষ্য করা যায়, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমেই এই দ্বন্দ্ব (Climax) চরম উৎকর্ষতায় পৌছায়। অবশেষে 'লবঙ্গে'র-ভূমি, ঘাস, লতা-পাতার মাঝে মিশে যাওয়ার মধ্যদিয়ে এই নাট্য আখ্যানের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

০৩.

অভিনয় উপাদান

এই আখ্যান পরিবেশনায় মুখ্য উপাদান তিনটি- বর্ণনাত্মক গদ্যাভিনয়, গীতাভিনয় এবং সংলাপাত্মক গদ্যাভিনয়। এ ছাড়া সংলাপাত্মক কাব্যাভিনয় উপাদানের কিছু গৌণ প্রয়োগ রয়েছে।

আখ্যানের বিভিন্ন অংশে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপাদানের ব্যবহার করা হলেও মূলত দুইটি অংশে এই উপাদান সমূহের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। প্রথমত; বাইচ নৌকার মাঝিদের অজানা চরে অবতরণ পূর্ব ঘটনাংশের মূখ্য অভিনয় উপাদান বর্ণনাত্মক। এই অংশে বাইচ নৌকার গতি এবং মাঝিদের উন্মাদনা ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য দ্রুত লয়যুক্ত সুর, তাল এবং ছন্দ সমন্বিত বর্ণনাত্মক গীত মূখ্য অভিনয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি এই অংশে মাঝি

সর্দার করিম বর্ণনাত্মক গদ্যাভিনয়ের মাধ্যমে (গল্প পরিবেশন) তাদের কৌতূহলী যাত্রার সাথে রূপকথার সম্পর্ক তৈরি করে। দ্বিতীয়ত; আখ্যানের ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান থেকে সমাপ্তি সঙ্গীত পর্যন্ত ঘটনাংশে বর্ণনাত্মক গদ্যাভিনয়, গীতাভিনয় এবং কাব্যাভিনয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। এই অংশের পরিবেশনায় গায়েন (রুস্তম) বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় ও গদ্যাভিনয়ের মাধ্যমে ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান করে মূলত ভূমির অতীত রহস্য ৫২ এবং ৭১-এ রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। ইতিহাস বর্ণনার এই সূত্র ধরেই উপস্থাপিত হয় 'নিষাদ ও পক্ষীকুলের* দ্বন্দ্ব। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির কথোপকথনে সংলাপাত্মক কাব্যাভিনয়ের ব্যবহার ইতিহাসের দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তোলে। আবার আখ্যানের বিয়োগান্তক পরিণতি অংশে করুণ রসাত্মক অভিনয়ের জন্য বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের ব্যবহার করা হয়।

অন্যদিকে মাঝিদের অজানা চরে অবতরণের পর থেকে ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান অংশ পর্যন্ত আখ্যানের মূখ্য অভিনয় উপাদান সংলাপাত্মক গদ্য। ভূমিতে রক্তের স্বাদ অন্বেষণ, মাটি খনন, বন্দী হওয়া প্রভৃতি ঘটনার আবেগ, অনুভূতি এবং দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য সংলাপাত্মক গদ্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবস্থায় যেখানে মাঝিগণ আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হলে লবঙ্গ মাটিতে মিশে যায়, ঘটনার এই অংশের অভিনয় উপাদানও সংলাপাত্মক গদ্য। সুতরাং 'শুরু করি ভূমির নামে' পরিবেশনায় অভিনয় উপাদান প্রয়োগে সুস্পষ্ট তিনটি পর্যায় রয়েছে যা আখ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পরিবেশনার প্রারম্ভ সঙ্গীত বা প্রার্থনা সঙ্গীত থেকে মাঝিদের চরে অবতরন পূর্ব ঘটনা বিন্যাসের মূখ্য অভিনয় উপাদান বর্ণনাত্মক (গীত এবং গদ্য)। সংলাপাত্মক উপাদান এখানে গৌণ। চরে অবতরণ থেকে ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান-পূর্ব অংশের মূখ্য অভিনয় উপাদান সংলাপাত্মক গদ্য। বর্ণনাত্মক অভিনয় উপাদান এখানে গৌণ। ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান থেকে মাঝিদের আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্ব অংশের পরিবেশনায় বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক উভয় উপাদান গুরুত্বপূর্ণ যা যৌথভাবে আখ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এবং সবশেষে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনাত্মক গীত উপাদানের মাধ্যমে আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'শুরু করি ভূমির নামে' একটি গায়েন প্রধান পরিবেশনা। অর্থাৎ এখানে আখ্যানের ঘটনা সমূহ একজন গায়েন বর্ণনাত্মক (গীত ও গদ্য) অভিনয়ের মাধ্যমে পরিণতিতে নিয়ে যান। কিন্তু এই বর্ণনাত্মক বিন্যাসের বিভিন্ন অংশে পরিবেশিত হয় সংলাপাত্মক অভিনয়। প্রযোজনার বিভিন্ন অংশে এই দুইটি উপাদানের মধ্যে কখনো বর্ণনাত্মক অভিনয় উপাদান আবার কখনো সংলাপাত্মক অভিনয় উপাদান ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবেশনার গায়েন আখ্যানের বর্ণনাত্মক অভিনয়ের পাশাপাশি রুস্তম চরিত্র সংলাপাত্মক অভিনয় করেন। ফলে গায়েনের বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ে পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট

* নিষাদ বলতে এখানে পাকিস্তানী স্বৈরশাসক ও পক্ষীকুল বলতে বাংলার মুক্তিকামী সাধারণ জনতাকে বোঝানো হয়েছে।

একটি চরিত্র কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গায়েন নিজেকে শুধুমাত্র রুস্তম চরিত্রে রূপান্তর করেন। এছাড়া করিম মাঝি কর্তৃক বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে একটি গল্প পরিবেশনা ব্যতীত অন্য সকল কুশীলব কেবলমাত্র পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট চরিত্রে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। মাঝিদল নির্ধারিত চরিত্র ছাড়াও গায়েন পরিবেশিত গীতাভিনয়ের সময় নৃত্য এবং ধুয়া পরিবেশনা করেন। গায়েন ও তার দল (মাঝিদল) আখ্যানের নাট্যিক আয়তন পরিবর্তন বা দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য মঞ্চের বাইরে থেকে প্রবেশ বা প্রস্থান করেন না। এক্ষেত্রে তারা অভিনয় আয়তনের বিভিন্ন তল পরিবর্তন করে দৃশ্যের পরিবর্তন করেন।

০৪.

মঞ্চ পরিকল্পনা

সমগ্র নাটলিপিতে রয়েছে একটি কৌতূহলী যাত্রা। এই যাত্রা কোনো একটি ভূমির দিকে, ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরের দিকে। উত্তাল জলরাশি, গহীন জঙ্গল আর প্রতিবাদ- বিক্ষোভের বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে অবশেষে আবিষ্কৃত হয় এই ভূমি।

'শুরু করি ভূমি নামে' প্রথম পাঠের পর নাটলিপি বর্ণিত সকল বৈচিত্র্যপূর্ণ নাট্যিক আয়তন ধারণে সক্ষম এক অভিনয় আয়তন নির্মাণ করাই ছিল প্রথম এবং বড় ধরনের সমস্যা। তবে শুরু থেকেই একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, প্রসেনিয়াম মঞ্চের সীমাবদ্ধ আয়তন নয় বরং উন্মুক্ত এবং নিরপেক্ষ কোনো আয়তন হতে পারে এই বিশাল নাট্যিক আয়তন ধারণের বিশ্বাসযোগ্য এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র। কারণ, নাট্যকার এখানে যে 'ভূমি'র কাহিনী বলতে চেয়েছেন তা আমাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বিশাল প্রেক্ষাপট। সেখানে প্রতি ইঞ্চি ভূমির স্বাদ, রক্তের ঘ্রাণ, হাড়, লোহা- কাপড় প্রভৃতি যেমন একদিকে অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে তেমনি রয়েছে একাধিক নাট্যিক আয়তন যেমন, গড়াই নদীর নৌকা বাইচ, প্রভুজীর বাড়ি, গহীন জঙ্গল, বধ্যভূমি খনন স্থান, ৫২ এবং ৭১-এর প্রতিবাদের ক্ষেত্র, লবঙ্গের ভূমিতে মিশে যাওয়ার ক্ষেত্র।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ নাট্যিক আয়তন উপস্থাপনের জন্য যৌথভাবে নাট্যশালার উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ অভিনয় আয়তন ও প্রসেনিয়াম মঞ্চকে ব্যবহার করি। কেননা উন্মুক্ত এবং নিরপেক্ষ আয়তনে অভিনেতা প্রযুক্ত নাট্যক্রিয়ার মাধ্যমে নাট্যিক আয়তন রূপান্তর বা পরিবর্তন করা অধিক সহজ এবং তা দর্শকের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম। তাছাড়া এই ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়া অধিক নাটকীয় হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নদীর উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান দর্শকের নৌকাবাইচ দেখা অভিজ্ঞতার একটি বিশ্বাসযোগ্য আয়তন হয়ে উঠতে পারে অভিনয় স্থানের উভয় পাশের দর্শক মধ্যস্থ একটি উন্মুক্ত বাস্তব আয়তন। এরকম একটি আয়তনে অভিনীত বাইচক্রিয়ার প্রদর্শন দর্শক অভিজ্ঞতা এবং কল্পনায় সীমাহীন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম।

নিম্নে 'শুরু করি ভূমির নামে' মঞ্চ পরিকল্পনার ছকচিত্র প্রদান করা হলো।

শুরু করি ভূমির নামের মঞ্চ পরিকল্পনা

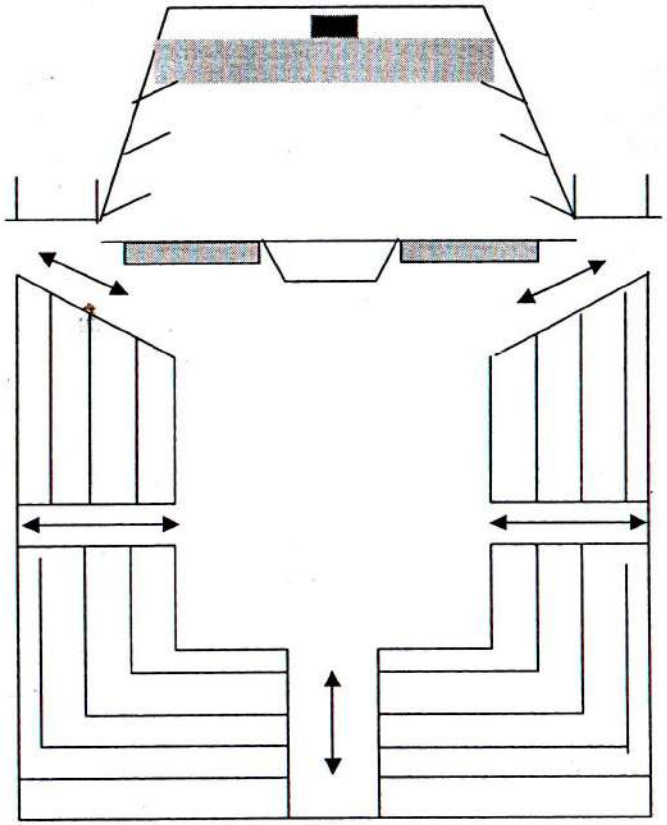

□ = তৃতীয় তল বা অভিনয় আয়তনের প্রথম পর্যায়, উচ্চতা. ১৫´
▩ = যন্ত্রী বা দোহার দলের অবস্থান
■ = তৃতীয় তল বা অভিনয় আয়তনের দ্বিতীয় পর্যায়, উচ্চতা ৮´
⊟ = দর্শক বেষ্টিত প্রথম তল বা অভিনয় স্থান
□ = প্রসেনিয়াম মঞ্চের দ্বিতীয় তল বা অভিনয় আয়তন

ছকচিত্রে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমীর নাটশালা অনুসারে মঞ্চ পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে। এই মঞ্চ পরিকল্পনায় তিনদিকে দর্শক অবস্থানে নাটশালার উন্মুক্ত স্থান ও প্রসেনিয়াম মঞ্চ উভয়কে একক অভিনয় আয়তন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে ছিল। তবে সমগ্র অভিনয় আয়তনটি তিনটি তল বা উচ্চতায় নির্মিত হয়।

অধিকাংশ নাট্যক্রিয়া পরিবেশিত হয় দর্শক বেষ্টিত প্রথম তল বা ভূমি সমতলের উন্মুক্ত আয়তনে। এছাড়া নাটশালার প্রসেনিয়াম মঞ্চের অভিনয় আয়তনে নির্মাণ করা হয় অপর দুটি তল বা আয়তন : মঞ্চের সম্মুখ ও মধ্যভাগে দ্বিতীয় তল এবং পেছন ভাগে নির্মিত হয় তৃতীয় তল। তৃতীয় তলের আবার দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে একটি বেদী এবং দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে বেদী সংলগ্ন একটি উঁচু পাটাতন। এই ধরণের অভিনয় আয়তন ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্মুক্ত বাস্তব আয়তনে একাধিক নাট্যিক আয়তন পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সহজ ও সাবলীল করে তোলা। এক্ষেত্রে আখ্যানের বাইচ নৌকার মাঝিদের অজানা চরে অবতরণ পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাংশ প্রথম তলে পরিবেশিত হয়। আখ্যানের মধ্যখ অর্থাৎ চড়ে অবতরণের পর থেকে ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান পূর্ব ঘটনাংশ পরিবেশনার জন্য যৌথভাবে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তল ব্যবহার করা হয়। এই খ. একাধিক নাট্যিক আয়তন যেমন প্রভুজীর বাড়ি, বধ্যভূমি, জঙ্গল প্রভৃতি স্থান যুগপৎ ভাবে উপস্থাপন করার জন্য তিনটি তল ব্যবহার করা হয়। সবশেষে আখ্যানের ধাঁধাঁর উত্তর প্রদান থেকে সমাপ্তি সঙ্গীত পর্যন্ত অংশ উপস্থাপনার জন্য মূখ্যত প্রথম তল ব্যবহার করা হয়। তবে এই অংশের পরিবেশনায় তৃতীয় তলের দ্বিতীয় স্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে।

আখ্যানে 'নিষাদ' নামে একটি চরিত্রের কথা বলা হয়েছে- যারা যুগে যুগে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নেমে আসে এই ভূমিতে। যেহেতু তারা এই ভূমিজ সন্তান নয় এবং যেহেতু তারা ভিন দেশ থেকে উড়ে আসা আক্রমণকারী, সেহেতু এই ভূমিতে তাদের অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা এবং দূরত্ব বোঝাতে উঁচু পাটাতনের ব্যবহার করা হয়েছে। নিষাদের দ্বিতীয় প্রবেশের ক্ষেত্রেও এই ভূমিতে তার পদ স্পর্শ ঘটে না বরং একাধিক বাধ্যকুলের (সৈন্য) ঘাড়ে চাপানো মসনদে চড়ে দেশের নিরীহ পক্ষীকুল (সাধারণ জনতা) এর ওপর আক্রমণ (আকাশ যুদ্ধ) পরিচালনা করে। এছাড়া তৃতীয় তলের প্রথম স্তরের আরেকটি বিশেষ ব্যবহার করা হয়েছিল।

আখ্যানে 'ভ্রমের নারী' নামে আরেকটি চরিত্র রয়েছে। নাট্য আখ্যানে এই চরিত্রটি স্বাভাবিক রক্ত মাংসের মানুষ নয়, অশরীরী কোনো 'মায়া' বিশেষ। এই ধরণের অতিলৌকিক চরিত্রের উপস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে দূরত্ব এবং উচ্চতাকে ব্যবহার করা হয়। মূলত, আখ্যানের বিভিন্ন নাট্যিক আয়তন অথবা দৃশ্য পরিবর্তনকে সাবলীল ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যই এই মঞ্চ পরিকল্পনায় অভিনয় আয়তনের তিনটি তল নির্মাণ করা হয়।

০৫.

প্রযোজনা নির্মাণ প্রক্রিয়া

'শুরু করি ভূমির নামে' নির্মাণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই সামগ্রিক প্রযোজনায় কুষ্টিয়ার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য অনুবর্তী হওয়ার একটি সচেতন ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। এক্ষেত্রে সহায়ক ছিল নাটলিপির ভাষা, যার বর্ণনাত্মক গদ্য অংশ ব্যতীত প্রায় সম্পূর্ণটাই কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। দলের সকল সদস্য কুষ্টিয়ার স্থানীয় হওয়ায় বেশ কয়েকজন কুশীলবের লোকনাট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। পাশাপাশি বোধন থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতায় দলের সকল কুশীলবদের জন্য আরও দুটি লোকনাট্য পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। এ লক্ষ্যে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমী নাটশালায় পরিবেশিত হয় 'পদ্মার নাচন' এবং 'রামায়ণ গান'। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে কুশীলবদেরকে প্রত্যক্ষভাবে লোকনাট্য রীতির অভিনয় উপাদান, অভিনয় স্থান ও চরিত্র পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যন্ত্রীদের সাথে গায়েন-এর সম্পর্ক, গায়েনের সাথে দর্শকবৃন্দের সম্পর্ক, দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। এই অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্তীতে লোকনাট্য উপাদানের প্রায়োগ সহজ হয়ে ওঠে। তবে সকল ক্ষেত্রে যে পুরোপুরি সফল হওয়া গেছে তা বলা যায় না। ঠিক একই ধারাবাহিকতায় কুষ্টিয়ার স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী 'বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী'তে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং এই দলের এক সদস্যা হোসনে আরা আফরোজ, দলের অন্যান্য সদস্যদের লাঠিখেলা ও শরীর ছন্দ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যদিকে সঙ্গীত পরিচালক কমল খালিদ-এর পরামর্শক্রমে কুষ্টিয়ার স্থানীয় লোকসঙ্গীত বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধারণা গ্রহণ করেন আরও বেশকিছু সদস্য। স্থানীয় লোকঐতিহ্যের ওপর এই প্রতক্ষ্য ধারণা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাটকটির বিষয়বস্তু, অভিনয় উপাদান, নৃত্য সহ প্রযোজনার সামগ্রিক ডিজাইনের সাথে স্থানীয় লোকঐতিহ্যের সমন্বয় করা। ফলে স্থানীয় দর্শক নাটকের অপরিচিত ঘটনা সত্ত্বেও অতি সহজেই কাহিনীর সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন।

০৬.

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহ

দ্রব্যসামগ্রী : প্রযোজনায় দ্রব্যসামগ্রীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। গায়েন সকল সময় তার বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক ক্রিয়া পরিবেশনায় একটি চামর ব্যবহার করেন। তিনি এই চামরটিকে কখনো খনন দৃশ্যের কোদাল, ভ্রমের নারী প্রভৃতি একাধিক অর্থে ব্যবহার করেন।

মাঝি বা দোহার দল তাদের ক্রিয়া পরিবেশনায় কেবলমাত্র লাঠি ব্যবহার করেন। এই লাঠিকেই তারা একাধিক অর্থে প্রয়োগ করেন। যেমন, বাইচ নৌকার বৈঠা, লাঠি খেলার লাঠি, খনন কার্যের কোদাল, প্রতিবাদের হাতিয়ার প্রভৃতি।

তবে লাঠি ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আখ্যানের পরিনতিতে এই লাঠি একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লবঙ্গের অধিকার নিয়ে মাঝিদল যখন আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং লবঙ্গ ভূমিতে মিশে যায়, তখন প্রথম তলে শুধুমাত্র কিছু লাঠি পড়ে থাকে। যা লবঙ্গের ঘাস, লতা-পাতা হয়ে ভূমিতে মিশে যাওয়া নির্দেশ করে।

নিষাদ ও তার সহচরীগণ মুখোশ পরিধান করে। মুখোশ ব্যবহারের উদ্দেশ্য প্রথমত, লোকনাট্য ঐতিহ্যের অতিপ্রাচীন একটি উপাদান হিসেবে এই মুখোশের ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, নিষাদ চরিত্রের অভিনেতার অভিব্যক্তিকে গৌণ করে মুখোশটিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। উদ্দেশ্য মুখোশের স্থির অভিব্যক্তি থেকে নিষাদ সম্পর্কে দর্শক কল্পনায় সীমাহীন স্বাধীনতা প্রদান করা।

আলো : আলোক পরিকল্পনার একটি সাধারণ কৌশল হচ্ছে অভিনয় আয়তনের তল পরিবর্তনের সাথে আলোক প্রক্ষেপণেরও পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ কুশীলবগণ দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য অভিনয় আয়তনের একটি তল থেকে অপর একটি তলে প্রবেশের সাথে সাথে পূর্ববর্তী তলের আলো নির্বাপণ করে পরিবর্তিত তলের আলো প্রজ্বলন করা হয়। এই কৌশলের কারণে দৃশ্য অনুযায়ী কোনো একটি তলের আলো নির্বাপণ করা হলেও সামগ্রিক পরিবেশনায় মঞ্চের আলো নির্বাপণ করা হয় না।

'শুরু করি ভূমির নামে' মিশ্ররীতির প্রযোজনা হলেও নাটকটির ঘটনা বিন্যাস পাশ্চাত্য বাস্তব ধর্মী নাট্যরীতি অনুসরণ করে এবং এক্ষেত্রে মূখ্য অভিনয় উপাদান সংলাপাত্মক গদ্য। তথাপিও বর্ণনাত্মক উপাদান এই নাটকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা আখ্যানের নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার উপস্থাপন ও নিয়ন্ত্রণে বর্ণনাত্মক উপাদান মূখ্য ভূমিকা পালন করে।